International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-II, September 2017, Page No. 34-40
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ: জিন্না ও সাভারকার

অশোক কুমার গিরি
শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In India, the nationalist thought has been infected by the festering ghetto communalism. The foundation of such narrowness can be traced back to the leaders, Muhammad Ali Jinnah and Vinayak Damodar Savarkar and also to the institutions, RSS, Hindu Mahasabha and Mulim League. As a result, on the one hand the pace of nationalist movement got hindered, and on the other, Indians have to accept the traumatic phenomenon, the partition. The dominance of Hindu leaders in Indian National Congress, the evil of disbelief among the muslim-Hindus have turned the patriotic and secular Jinnah into the leader of a particular community. Savarkar has defined nationalism in terms of Hindutya, his motto being the unity of the Hindu Community in the Political scenario. Although nationalism and communalism are contradictory to each other, in India the former fails to deny the latter. By too much pampering to narrow religious sentiments in nationalism, many leaders have become so-called national leaders and made themselves relevant in the contemporary political milieu.

Keywords: Communalism, Hindutya, Nationalism, Patriotism, Religion, Secularism.

ভূমিকাঃ জাতির প্রতি অনুরাগ, আসক্তি ও অতীত গরিমার ভিত্তিতে জাতীয় আবেগ ও দেশপ্রেম গড়ে ওঠে, সেটাই হল জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উপাদান। রাষ্ট্রের গঠনে প্রয়োজন হয় জাতির এবং এক বা একাধিক জাতির মিলিত জাতীয়তাবাদী আবেগে রাষ্ট্র সুসংবদ্ধতা লাভ করে। জাতীয় পরিচয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা আন্দোলনের উপাদান জোগায়। আবার জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আধুনিক কালে জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী আবেগ ঘনীভূত হচ্ছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া বলে মনে করা হয়। তবে তার মানে এই নয় যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 'ইংরেজ মানসপুত্র'। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ জনগণের ঘামে-রক্তে ভেজা কর্ম ও চিন্তার ফসল। ইংরেজ শাসনের বিরোধীতার মধ্য দিয়েই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ, আবার এই ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলনের সময়কালে জাতীয়তাবাদী চেতনার উপর সংকীর্ণ ধর্মীয় আঘাত ঘটে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভ্রান্ত চেতনা সাম্প্রদায়িকতার চরম রূপ নেয়। সম্প্রদায় থেকেই সাম্প্রদায়িকতা ধারণার উদ্ভব। সম্প্রদায় বলতে বুঝি মানুষের এমন সব ছোট-বড় নানা গোষ্ঠীকে, যাদের মধ্যে কোন না কোন বিষয়ে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে জেগে ওঠে এক ধরনের ঐক্য চেতনা। সাধারণভাবে সম্প্রদায়গত অস্তিত্ব বা পরিচিতিকে ঘিরে গড়ে ওঠা চেতনা বোধকে সাম্প্রদায়িকতা বলা গেলেও ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বলতে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত চেতনাকেই

বোঝানো হয়ে থাকে এবং এক ধর্মের মানুষের সঙ্গে অপর ধর্মের সম্পর্কের নিরিখে তা একটি নেতিবাচক ব্যঞ্জনা লাভ করে। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, 'সাম্প্রদায়িকতা' পদটির শব্দগত তাৎপর্য যাই হোক না কেন বাস্তবে তা প্রায়শই এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতা বলতে বোঝানো হয় এমন এক ধরনের বিশ্বাস বা অনুভূতিকে-যার ভিত্তিতে মনে করা হয় যে, এক ধর্মাবলম্বী মানুষের স্বার্থ এক এবং অন্যান্যদের থেকে তা শুধু আলাদাই নয়, অনেক সময় পরস্পর বিরোধী। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার এই পার্থক্য কেবলমাত্র আচার অনুষ্ঠানগত বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়; তাদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থগত ভিন্নতার বিষয়টিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই, এই ধরনের চিন্তা প্রণালী থেকে মানুষের ধর্মীয় পরিচিতিকে ঘিরে এক ঐক্যচেতনা গড়ে ওঠে, তা সম-ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে যেমন স্বার্থের গ্রন্থিবন্ধনে সচেষ্ট হয়, তেমনই তা অপরাপর ধর্মাবলম্বী মানুষের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্যটাকেও প্রকটিত করে। এরফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা প্রতিযোগীতামূলক মনোভাব থেকেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভাবনার বিকাশ ঘটে। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে দূরে রাখা সম্ভবপর হয়নি। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনা ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলনে শুধুমাত্র বাধা দেয়নি, এটি দেশভাগ থেকে আজ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও দেশে দেশে লড়াই চালানোর ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে চলেছে। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের গর্বের আড়ালে আছে সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত রূপ। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের ভ্রান্ত বিশ্বাসে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, শিখ ও অন্যান্যরা স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত ও সংহত। ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনা বিস্তারের পিছনে লুকিয়ে ছিল উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিতদের স্থান ও পদ লাভ করার ঠাণ্ডা লড়াই। সেইভাবে সাধারণ জনগণের মধ্যে এই চেতনার আড়ালে ছিল শোষণের মতো সামাজিক টানাপোড়েন।

সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রেক্ষাপটঃ ডঃ বিপানচন্দ্র বলেন, উনিশ শতকের শেষপাদের পূর্বে ভারতে কোন সাম্প্রদায়িক টানাপোড়েন ছিল না। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত রাখতে ইংরেজরা ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। এক কথায়, ইংরেজ শাসন শোষণ অব্যাহত রাখতে, সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিয়ে তোলা ও হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি করাই ইংরেজদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারবর্ষে মোটামুটি ভাবে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত উদারনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার পর্যায় দেখা গিয়েছিল। ১৯৩৭ সাল এর পর সাম্প্রদায়িকতার কট্টর বা ফ্যাসিস্ট রূপ দেখা যায়। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে লাগলেন-ডব্লিউ.সি.স্মিথের ভাষায়, 'উন্মত্ততা, ভয়, অবজ্ঞা ও প্রচণ্ড ঘৃণার' মনোভাব নিয়ে। তাছাড়া ১৯২০ এর দশকের শেষদিকে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাবিগুলি কংগ্রেস যেভাবে মেনে নিয়েছিল, তাতে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাদের মনে সাম্প্রদায়িক ভাবনা জাগ্রত হয়েছিল। ১৯৩২ এর 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড' এবং তারপর ১৯৩৫ এর 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'-এ উদারনৈতিক সাম্প্রদায়িক দাবির প্রায় সবগুলোই মেনে নেওয়া হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দেওয়া এই সুযোগ-সুবিধার বিরোধিতাও জাতীয় কংগ্রেস করেনি। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমান উভয় উদারনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরই কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল। পরে জওহরলাল নেহেরু ও বামপন্থীদের চাপে পড়ে কংগ্রেস সরাসরি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আক্রমণ করতে থাকে। ১৯৩৪ ও ১৯৩৭ এর- নির্বাচনে কংগ্রেস শুধু এদের ঠাঁই দেয়নি তা নয়, ১৯৩৮-এ শেষ পর্যন্ত তাদের কংগ্রেস থেকে বের করে দিয়েছিল। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এইসময় রাজনৈতিকভাবে মুছে যাওয়ার অবস্থায় চলে যাচ্ছিল। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্যে তাদের খুঁজে নিতে হয়েছিল নতুন ভিত্তি ও নতুন কর্মসূচী। হিন্দু সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভাবনা বিস্তারে মাদ্রাজের 'জাস্টিস্ পার্টি', 'হিন্দু মহাসভা', 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' (আর.এস.এস) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আবার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মুসলিমলীগ-এর সরকারের পক্ষ নেওয়া, এবং লীগের প্রত্যক্ষ মদতে ঘটে যাওয়া বাংলার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিন্দু সমাজ ভালো চোখে নেয়নি। ১৯০৯

সালে ব্রিটিশ সরকারের মর্লে মিন্টো শাসন সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ডঃ তারা চাঁদ বলেন, মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারের পর নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে হিন্দুদের একাংশ 'হিন্দু মহাসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা অংশ যেমন মদন মোহন মালব্য, লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ এই দলের প্রতি সমর্থন জানান। এর ফলে ব্রিটিশদের বিভেদনীতি জয়ী হয়। এছাড়া খ্রিস্টোফ জেফ্রেল্ট মনে করেন, খিলাফত আন্দোলনের সময় ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করে ভারতীয় মুসলমানরা যেভাবে ইসলামিক সত্তাকে তুলে ধরে ছিলেন তার ফলেই হিন্দুরা হীনমন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে। হিন্দুরা আক্রামণাত্মক মুসলানদের বিরুদ্ধে পালটা সমাবেশ করে। হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি এমনই হয় যে গান্ধি ১৯২৭ সালে দুঃখের সঙ্গে বলেন, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে মানুষ আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, এই বিষয়টি এখন ভগবানের হাতে। এইভাবে ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদে ধর্মনিরপেক্ষতা ভাবনা ক্ষীন হয় এবং সাম্প্রদায়িক ভাবনা জাতীয়তাবাদকে সংকীর্ণ ও বিভক্ত করে তুলে। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে যাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল, তারা হলেন, আলি ভাতৃদ্বয়, এম.এ. জিন্না, সৈয়দ আহমেদ খান, থিওডর ব্রেক, মদনমোহন মালব্য, সাভারকার প্রমুখ। আলোচ্য প্রবন্ধে জিন্না ও সাভারকারের সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী ধারণা আলোচিত হল।

জিন্নার জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও সাম্প্রদায়িকতাঃ জিন্নার রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে- উদারনৈতিক সাংবিধানিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী, চরম জাতীয়তাবাদী, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত, জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। দ্বিতীয় পর্বে- জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী, দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনে আস্থাশীল জিন্না। তবে জিন্নার চিন্তাধারার এই পরিবর্তনের পেছনে আছে এক বিরাট প্রেক্ষিত। বিখ্যাত আইনজীবি হিসাবে জিন্নার প্রসার, ১৯০৮ ও ১৯১৬ সালে রাজদ্রোহ মামলায় তিলক-এর আইনজীবি হিসাবে তাঁকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করে তখনই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডে দাদাভাই নওরজির হাত ধরে জিন্নার রাজনীতিতে প্রবেশ। তিনি তিলকের চরমপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। জিন্না প্রথমে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধী ছিলেন। চরম জাতীয়তাবাদী ও 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দূত' জিন্নার ধারণায় ঐক্য ছাড়া স্বাধীন দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। জিন্না ১৯১০ সালে বোম্বাই মুসলিম নির্বাচক কেন্দ্র থেকে আইনসভার সদস্যপদে নির্বাচিত হন। ১৯১৩ সালে তিনি মুসলিম লীগের সদস্যপদ লাভ করলে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। জিন্নার সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ শুরু হয় ১৯২০ সালে নাগপুর অধিবেশনে। এই অধিবেশনে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। জিন্না খিলাফৎ আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন না এবং গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সমর্থন করেননি। আসলে এক্ষেত্রে জিন্নার প্রধান আপত্তি ছিল যে গান্ধি রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানদের সমর্থনের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করছেন। জিন্নার ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। ১৯৩৫ সালে মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে তিনি বলেন, 'ধর্মকে কিছুতেই রাজনীতিতে আসতে দেওয়া উচিত নয়। ধর্ম কেবল মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যেকার ব্যাপার'।

হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষে কংগ্রেসে বেশিরভাগ সদস্য ছিলেন হিন্দু, সেই কারণে মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে হিন্দু সংগঠন ধরে নিয়ে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মনে করত। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জিন্না মনে করেন, 'মুসলিম জনগণকে তাদের সম্প্রদায়কে অক্ষত রাখার জন্য সংগঠিত ও একত্রিত হওয়া উচিত'। এর সাথে আবার জিন্না হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯২৫ সালের শেষের দিকে একজন তরুন মুসলিম যখন বলেছিলেন, প্রথমত তিনি একজন মুসলিম, তার প্রত্যুত্তরে জিন্না বলেছিলেন, 'তুমি প্রথমত একজন ভারতীয় এবং তারপর একজন মুসলিম'। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে বুর্জোয়াদের স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্বার্থ এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ভারতের রাজনীতিতে এমন জটিল করে তুলেছিল ফলে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছিল। ভারতে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন প্রতিদিন জোরদার হচ্ছিল। কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক কাঠামো ও মুসলিম লীগের

সাম্প্রদায়িক কাঠামোর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়াদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ চেতনা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। ১৯২৮ সালে নেহেরুর সভাপতিত্বে ভারতে শাসন সংস্কারের জন্য গঠিত সর্বদলীয় কমিটিতে জিন্না মুসলিম সম্প্রদায়েরর স্বার্থে ১৪ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু অনেক হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিদের বিরোধীতায় তার প্রস্তাব বাতিল হয়। এই ঘটনায় জিন্না ব্যথিত হয়, তাঁর কাছে এটি ছিল, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেকার বিভাজনের রাস্তা। এরপর জিন্না দলবলসহ অধিবেশন ত্যাগ করেন। পরদিন দিল্লী রওনা হওয়ার সময় পার্সীবন্ধু জামসেদ নাসেরজি-র হাতে ধরে কাঁদতে কাঁদতে জিন্না বলেন, 'এবার আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল'।

এই পরিস্থিতিতে অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে কিছুদিনের জন্য লন্ডনে চলে যান। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি জিন্না দেশে ফিরে আসেন এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। জিন্না হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য আর সচেষ্ট হয়নি। তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যদিও দেশে ফেরার প্রথম পর্বে তিনি অনেকটা উদারনৈতিক সাম্প্রদায়িক ছিলেন। ১৯৩৬ সালে লাহোরে "... আমার প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য হল ভারতের কল্যাণ সাধন এবং কোন কিছুই আমাকে এই অবস্থান থেকে একবিন্দু সরাতে পারবে না"। জিন্না মুসলমান সম্প্রদায়কে সংগঠিত হয়ে প্রমাণ করতে বলেন তাদের জাতীয়তাবাদ হল নির্ভেজাল এবং ভারতের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও প্রগতির জন্য আগ্রহ দেশের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে কোন ক্ষেত্রেই কম নয়। এই সময় জিন্নার পরিকল্পনা ছিল মুসলিম লীগের ক্ষমতা বাড়িয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বাড়তি সুযোগ দেওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে সফল না হয়ে জিন্না এক চরমপন্থী সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে চরম সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের আদর্শ তুলে ধরেন। তিনি কংগ্রেসকে 'হিন্দুদল' ও কংগ্রেসি শাসনকে 'হিন্দুশাসন' বলে চিহ্নিত করেন। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে সাম্প্রদায়িক বার্তা দিয়ে বলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে আগ্রহী নয়, তাদের মূল লক্ষ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার। ১৯৪০ সালে আলিগড়ে ছাত্র সমাবেশে তিনি বলেন- গান্ধির আশা হল হিন্দু রাজ্যের মাধ্যমে মুসলিম জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করা ও দমন করা। ১৯৪১ সালে আলিগড়ে তিনি আরও বলেন, "পাকিস্তান শুধুমাত্র একটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নয়, একমাত্র লক্ষ্য, যদি তোমার এদেশে ইসলামকে পরিপূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাও"।

দীর্ঘদিন ধরে বহন করে আনা অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা থেকে জিন্না এইসব বক্তব্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী জিন্নায় আত্মপ্রকাশ করেন। এবং তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানালেন। এরপর জিন্না বলতে চাইলেন, হিন্দু মুসলাম দুটি ভিন্ন ধর্ম, হিন্দু সংখ্যাগুরুর শাসন মানেই ইসলাম সভ্যতার মৃত্যু... মুসলমানের যুক্তিসম্মত দাবি হল মুসলমান এক ভিন্ন জাতি। জিন্নার মতো নেতার সাম্প্রদায়িক অবস্থান লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচারকে উৎসাহিত করেছিল। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী মুসলীমরা উদারনৈতিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মুসলিমকে বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। জিন্না নিজে ১৯৪৩ সালে লিগের সম্মেলনে খান আব্দুল গফফর খানের মতো নেতাকে সমালোচনা করেছিলেন। জিন্না দ্বিজাতি তত্ত্বকে উপস্থিত করে পৃথক পাকিস্তানের দাবি করেন। ধর্মীয় জাতীয়তাবোধের প্রচার ছিল এইভাবেই, "লীগ ও পাকিস্তানের পক্ষে একটি ভোট মানে ইসলামের পক্ষে একটি ভোট"। জিন্না ও এই ধারণার ব্যতিক্রমী ছিলেন না। জিন্না মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে সফল হলেও নিজে কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন আধুনিক মনোভাবাপন্ন একজন রাজনীতিক। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বক্তৃতায় তিনি ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্রের আদর্শ তুলে ধরেন। ভারতীয় রাজনীতির স্ববিরোধ ও জটিলতা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। হিন্দু আধিপত্যের আশঙ্কা তাঁকে সাম্প্রদায়িকতার পথে পরিচালিত করেছে। একটা সময় রাজনীতির স্রোতে তিনি অনেকাংশে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন, যার পরিণতিতে তিনি ধর্মীয় ভাবাবেগকে আশ্রয় করে, সাম্প্রদায়িকতার বার্তা দিয়ে রাজনীতিতে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন।

সাভারকারের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও সাম্প্রদায়িকতাঃ সাভারকার হিন্দুধর্মের প্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদ ধারণাটি ব্যাখা করেন। তাঁর কাছে জাতীয়তাবাদ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল না। সাভারকারের জাতীয়তাবাদী আদর্শ দুটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বে ইতালির জাতীয়তাবাদী মাৎসিনির জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রভাব। এই পর্বে ধর্মের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিলেও সাভারকার কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা বলেননি। দ্বিতীয় পর্বে তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমর্থক হয়ে ওঠেন। সাভারকারের জাতীয়তাবাদী ধারণা তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যায় বৈদিক হিন্দুধর্মকে গৌরবান্বিত করে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি মনে করেন বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা ভারতের স্বাধীনতা ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সাভারকারের কাছে শিবাজী বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষে হুন ও মুসলিম শাসকরা আক্রমণ করে এদেশের হিন্দু ধর্ম, ঐতিহ্য ও দর্শনকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। সাভারকার তাই ভারতে বৈদিক যুগের গৌরব ফিরে পেতে হিন্দুধর্ম, দর্শন এবং হিন্দু আধ্যাত্মিকতার পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে সাভারকার হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন ও ১৯৩৮-৪৫ সালে তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন। তাঁর 'হিন্দুত্বঃ হু ইজ হিন্দু?' (১৯২৩ সাল) গ্রন্থটি হিন্দু জাতীয়তাবাদ বিকাশে প্রধান গ্রন্থ। সাভারকার হিন্দুত্বের ধারণাকে হিন্দু ধর্মের ধারণা থেকে ব্যাপক অর্থে প্রকাশ করেন। তাঁর কাছে হিন্দু ধর্মের ধারণার মধ্যে শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-বিচারের বিষয় আছে। কিন্তু হিন্দুত্ব ধারণার মধ্যে রাষ্ট্র, জাতি ও সংস্কৃতি ধারণাযুক্ত। সাভারকার বলেন, হিন্দু সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র এবং হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত নিজেকে একাত্ম ভাববে। তিনি মনে করেন হিন্দুরা একটি জাতি, হিন্দু রক্তের উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি। তাছাড়া সাভারকারের কাছে হিন্দু সংস্কৃতিই হলো হিন্দুত্বের বড় পরিচয়। একজন হিন্দু, হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতির ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির জন্য সবর্দা গর্ব-অনুভব করবেন। সাভারকারের কাছে দক্ষিণাপথ, জম্মুদ্বীপ, আর্যাবত ও ভারতবর্ষ কোন নামই হিন্দুত্বের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বকে প্রতিফলিত করে না, যা করে কেবল মাত্র হিন্দুস্তান। সাভারকরের মতে 'হিন্দু' শব্দটি এসেছে 'সিন্ধু' শব্দ থেকে। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলেই হিন্দুদের বাস। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষের ধর্ম হিন্দু ধর্ম। সাভারকারের মতে যাদের পিতৃভূমি, পূণ্যভূমি উভয়ই হিন্দুস্তান। তারাই প্রকৃত হিন্দু। যারা হিন্দু ধর্ম থেকে অন্যধর্মে ধমান্তরিত হয়েছেন তারা হিন্দু নয়। কারণ, হিন্দুস্তান তাঁদের পিতৃভূমি হলেও পূণ্যভূমি নয়। এই ভারতবর্ষ কেবলমাত্র হিন্দুদের পূণ্যভূমি। তবে যারা ধর্মান্তরিত হয়েছেন তাঁরা হিন্দুস্তানকে পূণ্যভূমি বলে যদি মনে করে তবে তারা হিন্দু হিসাবে গণ্য হবেন। হিন্দুর এই সংজ্ঞা দিয়ে তিনি একদিকে হিন্দুদের রাজনৈতিক ভাগাভাগি ঠেকালেন অন্যদিকে শিখ ও দলিত শ্রেণি যাতে মুসমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী তৈরী করতে না পারে তা নিশ্চিত করেন। আবার পিতৃভূমি ও পূন্যভূমি ধারণা দিয়ে তিনি মুসলিম ও খ্রিষ্টান তথা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষমতার অংশীদার থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন।

তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাভারকার হিন্দু সম্প্রদায়কে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ধর্মান্তরিত হিন্দুদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং হিন্দুদের সংগঠিত করতে জাতিভেদ দূর করতে চেয়েছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে 'সহভোজন' এর ব্যবস্থা করে সকল উচ্চ-নীচু জাতির হিন্দুদের একসঙ্গে ভোজনের ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন, "আজ থেকে আমি জাতির উচ্চ বা নিম্ন বিষয়ে বিশ্বাস করব না। উচ্চ ও নিম্ন জাতির মধ্যে বিবাহকে আমি বিরোধীতা করব না'। সাভারকারের মতে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনি লিখেছেন-একজন হিন্দু দেশপ্রেমিক যে নামেই হোক না কেন একই সাথে তিনি হলেন ভারতীয় দেশপ্রেমিক; হিন্দুদের কাছে হিন্দুস্তান যেহেতু হল পিতৃভূমি এবং পবিত্রভূমি, সেই কারণে হিন্দুস্তানের প্রতি তাদের ভালবাসা হল অপরিসীম। সেই কারণে ব্রিটিশ দাসত্বকে পরাস্ত করতে যে সংগ্রাম অব্যাহত আছে, সেখানে তারা আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি মনে করেছেন হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য কোন মানুষ অতিক্রম করতে পারবে না। তিনি মনে করেন হিন্দুরা শুধুমাত্র একজন কালিদাস অথবা ব্যাসকে নয়, সাধারণভাবে রামায়ন, মহাভারত এবং বেদসমূহকে পেয়েছে।

সাভারকার মনে করতেন ইসলাম ধর্ম অসহিষ্ণু, গোঁড়ামি ও আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন। হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা ও হিন্দু ধর্মের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন প্রতিহত করতে হলে হিন্দুধর্মকে আগ্রাসী ও গোঁড়া হতেই হবে। তিনি হিন্দুদের কাছে মহান ঐতিহাসিক ঐতিহ্য তুলে ধরেন এবং পবিত্র হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি জঙ্গি হিন্দু জাতি গঠনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সাভারকার হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ চেতনা বিস্তার করতে সচেষ্ট হন। হিন্দু মহাসভার কর্মসূচী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, মহাসভা প্রধানত হিন্দু ধর্ম সভা নয়, এটি একটি হিন্দু রাষ্ট্র সভা এবং একটি প্যান-হিন্দু সংগঠন, যা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলোকে নিয়ে একটি হিন্দু জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করবে। ভারতের মতো বহু সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশে সাভারকারের হিন্দু জাতি ও হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভাবনা অনেকটাই সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ এর পরিচয় বহন করে। কানপুরে এক ছাত্র সমাবেশে তিনি ঘোষণা করেন যে, জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায়, তা হল বস্তুতপক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িকতা, যে সম্প্রদায় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং এখনও এই দেশকে শাসন করার প্রত্যাশা করে। সাভারকারের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে এ.জি. নুরানি তাঁর 'সাভারকার অ্যান্ড হিন্দুত্ব' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী শিখা সাভারকার প্রজ্বলিত করেছিলেন, সেটি ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়।

মূল্যায়ণঃ সাধারণত জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা পরস্পর বিরোধী। সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ ভাবনাকে বলা হত জাতীয়তাবাদ বিরোধী নতুবা সাম্প্রদায়িক। ভারতে অবশ্য জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা উভয় উভয়কে অস্বীকার করেতে পারেনি। ভারতবর্ষে তাই জাতীয়তাবাদী অনেক নেতা ধর্মকে আশ্রয় করে রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিলেন। ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক ভাবনা বিস্তারে জাস্টিস্ পার্টি, হিন্দু মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় তেমনি মুসলিম সাম্প্রদায়িক ভাবনা বিস্তারে মুসলিম লীগ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বিভিন্ন সংগঠনের আড়ালে সাভারকার, মদন মোহন মালব্য, তিলক প্রমুখ হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা এবং সৈয়দ আহমেদ খান, মহম্মদ ইকবাল, মহম্মদ আলি জিন্না- এর মতো মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতারা সাম্প্রদায়িকতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন ভারতীয় সমাজের কাছে। আসলে সে সময়ে জাতীয় কংগ্রেসে হিন্দুদের আধিপত্য মুসলিম নেতাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করেছিল। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল করার জন্য ইংরেজরা সুকৌশলে ধর্মীয় বিভাজনের বার্তা দিতে শুরু করে। যেগুলো ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক ভাবনা বিস্তারে সাহায্য করে। মুসলিম লীগের মতো প্রতিষ্ঠান এই ধরনের সাম্প্রদায়িক ভাবনাকে সুসংগঠিত করেছিল। দেশভাগের মধ্যদিয়েও এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ইতি ঘটেনি। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে আজও ভারতে জিন্না পন্থী, সাভারকার পন্থীরা বিভিন্ন সময়ে সংঘর্ষে মেতে ওঠে। রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মীয় তোষণ, মুসলিম সমাজের এক অংশের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব, হিন্দু সমাজের এক অংশের উগ্র হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন, ধর্মীয় মৌলবিদের উস্কানিমূলক মন্তব্য ভারতে সবসময় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলেছে। এছাড়া ভারতবর্ষে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র, পুস্তক, পত্রিকা, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মিডিয়া ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন বিকৃত তথ্য পরিবেশন করছে, যার ফলে সাম্প্রদায়িকতা দিনে দিনে যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা যথেষ্ট উদ্বেগ-এর কারণ। সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষের এক ঐতিহ্যময় কলঙ্ক। বহিঃবিশ্বের সভ্য সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি ভারতীয়দের অপরিসীম লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় জাতিগঠনে এবং দেশবাসীর সামগ্রিক উন্নয়নে সাম্প্রদায়িকতা ও অসহিষ্ণুতা এক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ

১) মল্লিক, সমর, আধুনিক ভারতের রূপান্তরঃ রাজ থেক স্বরাজ (১৮৫৮-১৯৪৭), নিউ জয়কালী প্রেস, কলকাতা, ১৯৯৬।
২) রহমান, এইচ, হিন্দু-মুসলিম রিলেশান্ ইন বেঙ্গল (১৯০৫-১৯৪৭), সাউথ্ এশিয়া বুকস্, ইউ.কে, ১৯৮৬।
৩) সাভারকার, বিনায়ক দামোদর, হিন্দুত্বঃ হু ইজ্ এ হিন্দু?, ভি. সাভারকার প্রকাশন, বোম্বাই, ১৯৬৯।
৪) চঁন্দ্র, তারা, হিস্ট্রি অফ্ ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, পি.ডি.এম.আই.বি, ইন্ডিয়া, ২০১৭।
৫) স্মিথ, ডব্লু.সি., ইসলাম্ ইন মর্ডান হিষ্ট্রি, প্রিন্সটন ইউনিভারসিটি প্রেস, নিউ জার্সি (ইউ.এস.এ), ১৯৫৭।
৬) মুখার্জী, হীরেন, ইন্ডিয়ান স্ট্রাগেলস্ ফর ফ্রিডম, কুটুব, বোম্বাই, ১৯৪৮।
৭) বিপানচন্দ্র, কমিউনালিজম্ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া, ভিকাস্ পাবলিশিং হাউস, নয়ডা, ১৯৮৪।
৮) রায়চৌধুরী, লাডলী মোহন, ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশ বিভাগ, দে'জ পাবলিসিং, কলকাতা, ২০০৪।
৯) গোপাল, এস., জওহরলাল নেহেরু- এ বায়োগ্রাফি (১৮৮৯-১৯৪৭), জোনাথান্ কাফে, লন্ডন, ১৯৭৫।
১০) মজুমদার, এস.কে., জিন্না অ্যান্ড গান্ধি, ফিরমা কে.এল. কলকাতা, ১৯৬৭।
১১) ম্যাকিন্, লিস্, ডিভাইন্ এন্টারপ্রাইস গুরুজ্ অ্যান্ড দি হিন্দু ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট, ইউনিভাসিটি অফ্ চিকাগো প্রেস, ইউ.এস.এ, ১৯৯৬।
১২) হাসান, এম., ন্যাশনালিজম্ অ্যান্ড কমিউনাল পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া (১৯১৬-২৮),মনোহর পাবলিকেশন্, নিউ দিল্লি, ১৯৭৯।
১৩) বন্দোপাধ্যায়, শেখর, পলাশি থেকে পার্টিশানঃ আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকস্টোন, কলকাতা, ২০০৭।
১৪) উমর, বদরুদ্দিন, ভারতের জাতীয় আন্দোলন, ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড, ইউনিভারসিটি অফ্ মিচিগান, ১৯৯৩।
১৫) দাশগুপ্ত, সুরজিৎ, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০৪।